একটি আধা-লৌকিক প্রতিবেদন

স্বপ্না ভট্টাচার্য

তারাপুর তখন তেপান্তরের মাঠ। সেখানেই প্রথম দেখা তার সঙ্গে। চিঠিবুড়ির কোলে সে। ভোরের আলোয় রঙিন হয়ে আসা দিগন্তে লাল টিপ। চারিদিকে স্তব্ধতা...মাঝে মাঝে পাখির কূজন। অন্তহীন মাঠকে কোনাকুনি ভাগ করে চিঠিবুড়ি তখন পাড়ি দিচ্ছিল পথ।...সকালে শিউলি ফুলের গন্ধ... স্থলপদ্মের বর্ণচ্ছটা আর শিশিরে ভেজা ঘাস.... চিঠিবুড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল তেপান্তরের মাঠ। আকাশের পুব কোনে রবিমামা হামা দিচ্ছিল...গায়ের রাঙা জামা...ধীরে ধীরে সোনা ছড়াতে শুরু করেছে। হিমেল হাওয়া বইছিল। আর শস্পপথে পা ফেলে শিশিরে মাখামাখি হয়ে চিঠিবুড়ি যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, কার্তিকের হিমেল হাওয়া ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল প্রত্যয়কে। তখন কি সে প্রত্যয় হয়ে উঠেছিল? কাদার তালের মতো ছোট্ট শরীর নিয়ে চিঠিবুড়ির কোলে চেপে এগোচ্ছিল গন্ত্যব্যের দিকে।

গন্তব্য?

গন্তব্য কী? কোথায়? সে জানত না।

চিঠিবুড়ির গায়ের চন্দনগন্ধ শরীরে মেখে ওর কাঁখ ভেঙে এগোচ্ছিল। কোথায়? চন্দন গন্ধ...চন্দন গন্ধ... আর চরাচর ব্যাপ্ত করে মঙ্গলারতির গানের সুর ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশে বাতাসে। 'রাই জাগো গো...জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...' গানের পদাবলী বোঝার বয়স তার তখন হয়নি...কিন্ত সুর? আজও তো ভুলতে পারেনি! কাঁসর ঘণ্টার শব্দে মাখামাখি হয়ে কথাগুলি সুরের মহিমায় ঢুকে গিয়েছিল প্রত্যয়ের চেতনায়। শব্দ গন্ধ স্পর্শ দৃশ্য! বাঁ-হাতে চিঠিবুড়ির স্তনবৃন্ত খুঁটতে খুঁটতে সুঘ্রাণ নিতে নিতে সেই কার্তিকের হিমেল মাঠে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। অরুণ আলোয় তেপান্তরের না কী তারাপুরের মালিনী বিলের মাঠে শেফালি শুভ্র ধূতি পরা অনিন্দ্য সুন্দর এক সৌম্য অবয়ব কুন্দ পুষ্প নিন্দিত দন্তপাঁতির আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে যেন দাঁড়িয়েছিলেন...যেন বলেছিলেন- 'কোথায় চলেছ? যেখানেই যাও পথ চিনে ফিরে এসো।' সত্যিই কি বলেছিলেন না কী প্রত্যয়ের অপরিণত মন এমন কল্পনা করেছিল!

শিশু প্রত্যয় কিছুই বোঝেনি। চিঠিবুড়ির দুলকি চালে হাঁটার ছন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। তারপর? শৈশবের অফুরান খেলাঘরে কতদিন কতরাত পেরিয়ে গেল।

তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল, তবে কোনো শম্পপথে নয়। ততদিনে একযুগ পেরিয়ে প্রত্যয় কৈশোরের প্রান্তসীমায়। তখন সে স্কুল-পড়ুয়া, খেলার মাঠে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করে, কাদায় মাখামাখি হয়। ওরিয়েন্টাল, কলাবতী সিনেমা হলে বড়দের চোখ এড়িয়ে সিনেমা দেখে। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তার পাশে ডাং-গুলি ও মার্বেল খেলে। ক্যাভেণ্ডার সিগারেটের বিজ্ঞাপনে উদ্দীপ্ত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার চেষ্টা করে। এ ছাড়া গুলতি নিয়ে পাখি শিকার...মদনের বাবার দোকান থেকে দু-পয়সার ঘুড়ি কিনে নাটাই নিয়ে হাসপাতালের মাঠে দৌড়াদৌড়ি। হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মিসেস কিমির বাংলোর পেছনে বেড়ে ওঠা জাম গাছ থেকে জাম পেড়ে খাওয়ার চেষ্টা। পাড়ার মোড়ে চালা বেঁধে সরস্বতী পুজো। প্রতিমা নিয়ে পুজোর পরদিন বিসর্জন মিছিল... সদর ঘাট থেকে শুরু করে সেন্ট্রেল রোড ধরে সেই মিছিল এগিয়ে যেত অম্বিকাপট্টির মোড় ঘুরে জেল রোড হয়ে শিলংপট্টির দিকে। আচমকা বন্দেমাতরম-আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে উত্তেজনা...তবে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মুখে মুখে ফেরা সেই গান...'ডাকে ঐ একাদশ শহিদেরা ভাই আর দেরি নয় দেরি নয়। সুপ্তি ভেঙে পথ...।'

কৈশোর পেরিয়ে যাওয়ার সেই সময়ে একদিন গোধূলি সন্ধ্যায় আলো আঁধারিতে অস্তমিত রবির আলোয় আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। তখন না শীত না গরম, না আলো না আঁধার। ফুলের গন্ধ কি ভেসে এসেছিল! তখন কি দখিনা বাতাস বইছিল? কিছুদিন আগে হোলি খেলা হয়ে গেছে। গানের স্কুলে বসন্ত উৎসব। উৎসব শেষে প্রত্যয় যখন বাড়ি ফিরছিল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। সঙ্গে ছিল তাঁরই তারই সমবয়সী এক বন্ধু। বিকাশ নাকী দিপাল! গলিপথ পেরিয়ে ওরা বরাক নদীর বাঁক ধরে এগোচ্ছিল। তখন চৈত্র মাস। ঈশান কোনে মেঘ জমেছিল। নদীর জল তলানিতে। নদীর বাঁধ ধরে চলতে চলতে ওরা নেমে গিয়েছিল চরের দিকে। রবিমামা আকাশে নেই অথচ চাঁদও ওঠেনি। দূরে মাঝি খেয়া পারাপার করছে। এখানে ভাটিয়ালি গান হয় না। হঠাৎ প্রত্যয় গেয়ে ওঠে 'আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।'...দিপাল নাকী বিকাশও গলা মিলিয়েছিল। নদীর চর ধরে ওরা হাঁটছিল। পূর্ণিমা চলে গেছে যদিও, আকাশে ফিকে আলোর আভাস। নদীর খাড়িতে দু-জনে বসে পড়ে। মাঝে মাঝে নদীতে দাঁড়ের শব্দ।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শুকনো পাতার উড়া ওড়ি। চরাচর জুড়ে তুমুল হাওয়া, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক। মাঝিদের ঘাটে নৌকা বাঁধার ব্যস্ততা। প্রত্যয় আর বিকাশ কিংবা দিপাল উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত পা চালায়। বালুকাবেলায় ওদের পা আটকে যেতে থাকে। আকাশ ফালা ফালা করছিল বিদ্যুতের দাপাদাপি। কোত্থেকে কালো মেঘের দল আকাশ দখল করে নিয়েছিল। আর ডায়নোসোরের গর্জনে দীর্গ হচ্ছিল আকাশ। তখনই বিদ্যুতের আলোয় তাকে দেখতে পায় প্রত্যয়। সাদা শুভ্র পোশাকে সৌম্য শান্ত মুখমণ্ডল। তবুও পুরোপুরি চেনা যায় না। রহস্যময় পুরুষটি দীর্ঘ তর্জনী তুলে কোনদিকে বুঝি ইঙ্গিত করছিল। চকিতে প্রত্যয় বুঝে নেয় এ সেই শিশুবেলায় তেপান্তরের মাঠে প্রথম দেখা অলৌকিক মানুষ। বিদ্যুতের আলো সরে-গেলে প্রবলবৃষ্টির দাপটে ভিজতে ভিজতে প্রত্যয় আবিষ্কার করে, ওরা নিজেদের জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শরীর মনে বিচিত্র শিহরণ। বৃষ্টির শব্দে ওর বিহ্বল মুহূর্তগুলি পেরিয়ে যেতে থাকে। আলিঙ্গন শিথিল হয়। বৃষ্টির দাপট ক্রমাগত বাড়ে। বালি পেরিয়ে বৃষ্টি ঢাকা পথে দু-জনে এগোতে থাকে। প্রত্যয় ভাবে, 'এ আমি কী দেখলাম? স্বপ্ন না মায়া? শৈশবের সেই ঘটনা তাহলে কি অলীক ছিল না?' সেই বৃষ্টিঝরা রাতে ওরা ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে নিয়েছিল।

তারপর পেরিয়ে গেছে আরও কিছুদিন। 'দিনকাল' পত্রিকায় রবিবার একটা কলাম বেরোত। 'অলৌকিক'। প্রত্যয়কে ওটা নেশার মতো টানত। পাশের বাড়ির সোনারুর দোকানে পত্রিকাটি আসত। রবিবার দোকান বন্ধ থাকলেও প্রত্যয়ের অপেক্ষা থাকত সেই কলাম পড়ার জন্যে। দোকানের দরজার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে পত্রিকা টেনে নিয়ে প্রত্যয় কলামটি গোগ্রাসে গিলত। ভাবত, অলৌকিক কি মিলে যায় বাস্তবে নাকী সবটাই ভ্রম?...তবু রহস্য হাতছানি দিত। এই কলামেই প্রত্যয় পেয়ে গিয়েছিল সন্ধান... কাঁচা পাকা দাঁড়িওয়ালা একটা লোকের পরনে থাকত শ্বেতশুভ্র ধুতি আর সাদা ফতুয়া। মুখে মৃদু হাসি। তার হঠাৎ উপস্থিতি একজনকে চমকে দিত। যেদিন এই বিস্ময়কর লোকটাকে দেখা যেত সেদিন থেকেই জীবনে ছন্দপতন হয়ে যেত। সেই দর্শক জীবনে বেশ ক'বার সেই শ্বেতশুভ্র বস্ত্র পরিহিত রহস্যময় অলৌকিক অস্তিত্বকে দেখেছে। পথেঘাটে যখনই দেখা পেয়েছে তারপর থেকেই বাঁক ফিরেছে জীবন। কিন্তু ধরা ছোঁয়ার মধ্যে কোনোদিন সেই অস্তিত্বকে পাওয়া যায়নি। প্রত্যয়ের মনে এই বিবরণ গাঢ় হয়ে বসে গিয়েছিল। লৌকিক-অলৌকিক, আলো আঁধারিতে ধুপছায়ায় দুলছিল ওর বয়ঃসন্ধি। নইলে কি আর মনে মনে সেও খুঁজছিল সেই দাঁড়ি গোঁফওয়ালা আবছা মুখের

অস্তিত্বকে যে কীনা তারও জীবন পাল্টে দেবে! এই অস্তিত্ব কি অন্যদের কাছে ধরা দেয়? না কী সব ইশারা তারই জন্যে!

প্রত্যয়েরা দুই ভাই এক বোন। প্রত্যয়ের বাবা প্রতিষ্ঠিত উকিল। বাবা-মা-ভাই-বোন নিয়ে প্রত্যয়দের জমজমাট দোতালা বাড়ি। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক। বরাক নদীর নাব্য স্রোতের মতো বইছিল ওদের জীবন। ইতিমধ্যে সাফল্যের সঙ্গে কয়েকবছর পেরিয়ে গেছে। ওর নামের শেষে জুটেছে অনেক সর্বনাম। ভালো ছাত্রের শিরোপা পেয়েছে। প্রত্যয় অভাব কী জানে না। একদিন কলকাতা থেকে ওদের বাড়িতে এল ছ'ফুট লম্বা সুদর্শন ছেলে। নাম রঞ্জন। স্বামীহারা মায়ের একমাত্র ছেলে। প্রাণ বাঁচাতে কলকাতা থেকে রাতারাতি পালিয়ে শিলচর এসেছে। সম্পর্কে প্রত্যয়ের কাকা। বামরাজনীতির সক্রিয় কর্মী রঞ্জন রাজরোষে বাড়িছাড়া হয়। তার জন্যে কলকাতা তখন নিরাপদ ছিল না।

৬১ এর ভাষা আন্দোলনের পরে শিলচর তখন ভাষার লড়াই শেষে কিছুটা ঝিমুচ্ছে। আপাতভাবে রাজনীতির তাপ উত্তাপ খুব একটা অনুভুত হয় না। উদ্বাস্তু-মধ্যবিত্ত প্রধান এই শহরে উঠতি যুবকেরা তখন লেখাপড়া শিখে সরকারি দপ্তরে কিংবা স্কুলমাস্টার হয়ে জীবনে থিতু হতে চাইছে, সেসময় ক'দিনেই মৃদু-ভাষী সদাপ্রফুল্ল রঞ্জনের সঙ্গে প্রত্যয়ের ভাব জমে উঠল। শুরু হলো রাত জেগে গল্প। দুজনের আলোচনায় প্রত্যয়ের দিদিও মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নেয়, নানা প্রশ্ন করে। কোনো প্রশ্ন বা বিতর্ক রঞ্জনকে বিচলিত করতে পারে না। ক্রমশ গান্ধিবাদী বাবার ছেলে প্রত্যয় গান্ধিবাদে আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রত্যয়ের মায়ের বিয়েতে পাওয়া মেহগিনি কাঠের পালঙ্কের উপর বসে চলত তাদের আড্ডা। মাঝে মাঝে কেরোসিন শেষ হয়ে এলে লণ্ঠনের আলো লালচে হয়ে যায়। বিছানায় শুয়েও ঘুম আসত না প্রত্যয়ের। শ্রমিক শ্রেণি, বুর্জোয়া, উদ্বৃত্তমূল্য, শ্রেণিহীন সমাজ, লড়াই, অসাম্প্রদায়িক চেতনাঃ শব্দগুলি গেঁথে যায় প্রত্যয়ের চেতনায়, ওকে অস্থির করে তোলে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন- মানা-না মানা, আক্রমণ প্রতি আক্রমণঃ সব কিছুর তাৎপর্য পাল্টে যায়। দিন গড়ায়। প্রত্যয় কখন ভেতরে ভেতরে অনেকটা বদলে গেছে নিজেও টের পায়নি। একদিন সন্ধ্যায় গান্ধিবাদী পিতার সঙ্গে কন্যা ও পুত্র তর্কে লিপ্ত হয় । তখন প্রতিদিনই গ্রীষ্মের দাবদাহ। আকাশে মার্তণ্ড আগুন ঢালছিল রোজ। সেই সন্ধ্যায় দেখা হয় হঠাৎ কালবৈশাখী। তছনছ করে দেয় সব। শুধু হাওয়ার মাতন।

চতুর্দিকে ভাঙন আর পতনের শব্দ। ছেলের কথা শুনে পিতা হতভম্ব। ওদের মুখের দিকে কিছুটা বিষণ্ন, কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। রেগে গিয়ে বলেন- 'এতদূর?' আর তখনই পেছনের ডুমুর গাছের একটা ডাল সশব্দে ভেঙে পড়ে। বাইরের ঝড় যেন প্রত্যয়ের মনেও। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসা আকাশে প্রবল ভাবে বিদ্যুৎ চমকায় ঘন ঘন। আর সেই বিদ্যুতের আলোয় প্রত্যয়ের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় সেই শ্বেতশুভ্র বসন পরিহিত অবয়ব। রহস্যময়। কিন্তু এবার তার কোনো কথা শোনে না। বিস্মিত প্রত্যয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে।

দিদির আদরের ভাই, মায়ের কাজল, আর বাবার অবাধ্য ছেলে প্রত্যয় এখন পূর্ণ যুবক। পি.এন.টির কর্মী। 'to be or not to be' আর তাকে ভাবায় না এখন। শহরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন নিস্তরঙ্গ। বামরাজনীতি থমকে গেছে। জরুরি অবস্থার প্রচ্ছায়া জীবনকে তবু স্তব্ধ করে দিতে চায়। ধরপাকড় চলছে। গোপনে লিফলেট বিলি করে প্রত্যয়। গোপন সভা করে, ট্রেড ইউনিয়ন চাঙ্গা করার চেষ্টায় যোগ দেয়। ওর চালচলন মা-বাবার বুকে এখন কাঁপন ধরায়। ইতিমধ্যে রঞ্জন সাপটগ্রামে চলে গেছে ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে। অস্থির প্রত্যয় রাত জেগে বই পড়ে। পথ খোঁজে।

এসময় কোনো একদিন লোচন বৈরাগী রোডের মোড়ে দেখা হয় সমাদৃতার সঙ্গে। শ্যামলা লম্বাটে গড়ন, গভীর দু-চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে। বই পড়ে, সভা সমিতিতেও যায়। ধীরে ধীরে প্রত্যয় শ্যামলা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তার জীবনে পূর্ণতা নিয়ে এসেছে সমাদৃতা, অনুভব করে। একটি একটি করে কুসুম পাপড়ি মেলে তবুও যেন অব্যক্ত থেকে যায় অনেক কিছু। 'এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে' নীতিতে দুজনেই বিশ্বাস করে। সমাদৃতার সাহচর্য যেন চন্দন গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। মনে ঢেউ তোলে এই প্রশ্নঃ 'ও কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে?' অস্থিরতা বাড়ে। কি ভাবে বোঝাবে মনের কথা! কৈশোরে নদীতীরের ঝড়ের সন্ধ্যার সেই অনুভব সারা মনে শিহরন জাগায়। মন কি দেহ-নিরপেক্ষ হয়! বুকে রক্ত ছলকায়। আপাতত প্রত্যয়ের শ্রেণি-সংগ্রাম ঝিমোয়। সমাজে এখন জরুরি অবস্থার বিলীয়মান তাণ্ডব।

ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রভাবে এখানেও গড়ে উঠেছে জনতা পার্টির শাখা। সমাদৃতার বাবা এই দলের স্থানীয় নেতা। সমস্ত সমাজে শান্তি-কল্যাণ হয়ে আছে। মেয়েরাও রাজনীতিতে পিছিয়ে নেই এখন। সমাদৃতা চমকের পর চমক দিয়েই চলে।

এসময় একদিন মেডিকেল কলেজের গেটে প্রত্যয় সমাদৃতাকে দেখতে পায়। এখন শীতের শেষ, বাতাসে উষ্ণতার ছোঁয়া। মেডিকেল কলেজ চত্বরে মনোরম পরিবেশ, ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূরে ধানক্ষেতে ছড়িয়ে আছে শেষ অস্তরাগ। গোধূলি আলোয় পৃথিবী মায়াময়। সমাদৃতা দাঁড়িয়েছিল শিলচরগামী বাস ধরার জন্যে। প্রত্যয় দেখতে পায়, শ্যামলা মেয়ের মুখের ওপর মায়াবি আলো। তার বুকে রক্ত ছলকে ওঠে। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে প্রত্যয় সমাদৃতার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে,

- 'তুমি এখানে?'

- আরে, আপনি!

...

কথা যোগায় না প্রত্যয়ের মুখে। ধারালো কুয়াশা মনে। কনে-দেখা আলোয় উদ্ভাসিত সমাদৃতার মুখমণ্ডল। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই যেন জ্যোৎস্না নেমেছে দু-চোখে। 'দৃষ্টিতে কী শান্তি দিলে চন্দন চন্দন!' ছিপছিপে শ্যামাঙ্গী মেয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ার জন্যে অজস্র কথারা কলরোল করে ওঠে। সমাদৃতা শান্ত চোখে একবার তাকায়; তারপর বাঙ্ময় নীরবতা। প্রত্যয় বলে: 'চলো না একটু হাঁটি দু-জনে।' সমাদৃতা নিঃশব্দে পা বাড়ায়। গোধূলি আলোয় মেডিকেল কলেজের দরদালান ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে থাকে। শ্যামলা মেয়ের দীর্ঘ বিনুনি পিঠের উপর এক্কা দোক্কা খেলতে থাকে। মাঝে মাঝে চলার ছন্দে একটু আধটু স্পর্শ... প্রত্যয় কথা বলেই চলে। অন্তহীন। অর্থহীন। সন্ধ্যা গাঢ়তর হতে হতে রাতের দিকে ঢলে পড়ে। সমাদৃতার চুল থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, মাদকতা ছড়ায়। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও ঘন হলে অনর্গল কথার স্রোতের মধ্যে প্রত্যয় রুদ্ধ আবেগে বলে ফেলে-

-'সমাদৃতা, তুমি কি বোঝোনা আমি তোমাকে... বলতে না বলতে 'ভালবাসি' শব্দটি নিরুচ্চার ও সোচ্চারের সীমানায় থমকে যায়। যেন একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চুড়ে ভর করে সাতটি অমরাবতী। সমাদৃতা প্রত্যয়ের চোখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে প্রত্যয়ের বুকে ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে একটি লরি বিকট শব্দ করে পাশ কাটিয়ে ওদের চোখ মুখে ধাঁধানো আলো ফেলে চলে যায়। সেই তীব্র আলোয় প্রত্যয়ের চোখে ভেসে ওঠে এক শ্বেতশুভ্র অবয়ব, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। সেই হাসি লাবণ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে চরাচর জুড়ে। বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে প্রত্যয়। অস্ফুট উচ্চারণে বলে– 'এখানেও'

একটি নিমেষ যখন দাঁড়ায় সরণি জুড়ে, সমাদৃতার চোখে জেগে থাকে কুসুম-কুসুম আলো। অপার্থিব দ্যুতির বিচ্ছুরণ প্রত্যয়ের মনকে ধুয়ে দেয়। চিঠিবুড়ি-, রঞ্জন কাকু... বাবা... দিদি... সমাদৃতা...জ্যোতির্ময় রহস্য - অস্তিত্ব একাকার হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে প্রত্যয় সমাদৃতার হাত নিজের মুঠোয় টেনে নেয়। চারিদিকে চাঁপা ফুলের গন্ধ এখন আরও স্পষ্ট। পরিপূর্ণ চোখে সমাদৃতা লাবণ্যময় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে প্রত্যয়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। আলোর উদ্ভাস দুজনের অস্তিত্বে, চেতনার কোষে কোষে ছড়িয়ে যায়। নির্বাক প্রত্যয় সেই প্রগাঢ় মুহূর্তকে অনুভব করে, করতেই থাকে...